New Doc 04-06-20...

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (খি ঃ ১৮৬৯-১৯৪৮)

ড. রাখকৃষ্ণ দে

জীবনী

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর কাথিয়ার অঞ্চলের অন্তর্গত রাজন্যশাসিত পোরবন্দর রাজ্যের পোরবন্দর শহরে (যা বর্তমানে গুজরাট অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা করমচাঁদ গান্ধীর চতুর্থ স্ত্রী পুতলীবাঈ এর এক কন্যা ও তিন পুত্রের মধ্যে মোহনদাস গান্ধী ছিলেন কনিষ্ঠ পুত্র। গান্ধী পরিবার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও মোহনদাস গান্ধীর কয়েক পুরুষ আগে থেকেই গান্ধী পরিবার পৈত্রিক ব্যবসা ত্যাগ করে দেওয়ার কাজে যুক্ত হয়। পিতামহ উত্তমচাঁদ গান্ধী এবং পিতা করমচাঁদ গান্ধী ছিলেন পেশাগত ভাবে যথাক্রমে জুনাগড় ও পোরবন্দরের দেওয়ান। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং ধর্মভীরু গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান মোহনদাস গান্ধী ও ছিলেন শৈশব থেকেই ধর্মভীরু। পরিচারিকা রম্ভার কাছ থেকে রাম নামের মাহাত্ম্য (ভূতপ্রেতের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য রামনাম জপ করা) শ্রবণ, উপাখ্যান পাঠ থেকে পিতৃভক্তি বা হরিশ্চন্দ্র নাটক দেখে সত্যবাদিতার পাঠ নেওয়া, মাতা পুতলীবাঈ এর ঈশ্বর বিশ্বাস ও দৃঢ়তা, রামজির মন্দিরে লাধা মহারাজের কাছে রামায়ন পাঠ শ্রবণ, পিতা করমচাঁদ গান্ধীর জৈন ও মুসলমান বন্ধুদের সঙ্গে ধর্মালোচনা প্রভৃতি বিষয় গান্ধীর শৈশবকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

বাড়িতেই বর্ণপরিচয় ও নামতার পাঠ সেরে (এবং সম্ভবত বাড়ির কাছেই ধুল পাঠশালাতেও গিয়ে থাকতে পারেন) সাত বছর বয়সে মোহনদাস রাজকোটে বিদ্যায়তনের পাঠ শুরু করেন। ১৮৮৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন সাধারণ মানের

ফল নিয়ে। ইতিমধ্যে শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পন পর্বে গান্ধীর ধর্মভীরু লাজুক মানের সঙ্গে বাইরের বন্ধুজগতের হাতছানি ছিল। পাপ-পুণ্য বোধের দোদুল্যমানতা, তেরো বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই (সাত বছর বয়সেই বিবাহ বাগ-দান) কয়েক মাসের বড়ো ও মনের দিক থেকে দৃঢ় সচেতন কস্তুর মাকানজি কাপাড়িয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ষোল বছর বয়সে তিনি পিতৃত্বলাভ করেন, এবং ঐ একই বছরে তাঁর পিতার ও তাঁর সদ্যোজাত সন্তানের মৃত্যু হয়। এই দুই মৃত্যুকে ঘিরে এক গ্লানিবোধ (বিশেষত পিতার মৃত্যুকালীন সময়ে তাঁর কামাসক্তি) সত্য-মিথ্যার ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় গান্ধীকে মনোযোগী করে তোলে।

১৮৮৮ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে আইন পাঠের উদ্দেশ্যে বোম্বাই বন্দর থেকে লন্ডনের দিকে গান্ধীর যাত্রা শুরু হয় এবং ওই মাসের শেষের দিকে সাউদাম্পটন বন্দরে আগমনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় তৎকালীন অন্যান্য উচ্চাকাঙ্খী ভারতীয়দের মতো এলিট শ্রেনিতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা। কিন্তু ইউরোপীয় পোষাক পরিধান, নৃত্যগীত অনুশীলন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ইংলন্ডের ভদ্র সমাজে নিজের স্থান করে নেবার তাঁর সব প্রচেষ্টা অচিরেই ব্যর্থ হয়। যৌন প্রলোভন, অপচয় প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি যেমন সচেতন হতে থাকেন, নিরামিষ ভোজন সম্পর্কেও (ইংলন্ড আগমনের শর্ত হিসাবে মায়ের কাছে ইতিমধ্যেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ) কঠোর হতে থাকেন। আইন পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কেও এসময় তিনি পরিচিত হন। ১৮৯১ সালের ১০ই জুন ব্যারিষ্টারি পাশ করার পর ১২ই জুন ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্য তিনি যাত্রা শুরু করেন। আইনজীবী হিসাবে প্রথমে রাজকোট ও পরে বোম্বাইতে কাজ শুরু করলেও তাঁর লাজুক স্বভাব এই জীবিকার সাফল্যের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। মাত্র এক বছর কাজ করার শর্তে এক ভারতীয় মুসলিম বানিজ্যিক সংস্থার আইনজীবী হিসাবে তিনি ১৮৯৩ সালে দক্ষিণ আফি কার উদ্দেশ্যে রওনা হন যদিও এরপর প্রায় একুশ বছর তিনি দক্ষিণ আফি কায় অতিবাহিত করেন।

প্রথমে নাটাল ও পরে ডারবান সব মিলিয়ে প্রায় একুশ বছর দক্ষিণ আফি কার জীবনকে গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের সূতিকাগার বলা চলে। প্রথম দিকে তিনি উদারপন্থী মতাবলম্বী হলেও, দক্ষিণ আফি কায় গান্ধীর উপস্থিতি পর্বটি ছিল তাঁর নিজস্ব দর্শন ও কর্মসূচী গ্রহণ করার পর্ব। এসময় তিনি বর্ণবৈষম্যের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন যা তাঁর জীবনের পরবর্তী পর্বে জাতপাত বিরোধী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। এসময় তিনি রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনের পাশাপাশি

সামাজিক বৈষম্য, কুপ্রথা, বিবাহ সংক্রান্ত, অভিবাসনসংক্রান্ত সামাজিক নিয়মবিধির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হন। রাজনৈতিক আন্দোলন, সমাজসংস্কার, সেবামূলক কর্মসূচী গ্রহনের পাশাপাশি জনসংযোগ রক্ষার বিষয়টির উপরও গান্ধী বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন। ১৯০৩ সালের ৪ঠা জুন মনসুকলাল নজরের সম্পাদনায় 'ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন' প্রকাশিত হলেও গান্ধীই ছিলেন নেপথ্যের নায়ক এবং ১৯০৪ সালের অক্টোবর থেকে তিনিই পত্রিকাটি প্রকাশনার মূল দায়িত্ব নেন। ১৯০৬ ও ১৯০৯ সালে লন্ডনে রাজনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে তিনি দরবার করেন এবং দ্বিতীয় যাত্রায় অর্থাৎ ১৯০৯ সালের ১৩ই নভেম্বর থেকে ২২শে নভেম্বর কিলডোনান জাহাজে যাত্রাকালীন 'হিন্দ স্বরাজ'/ইন্ডিয়ান হোমরুল রচনা করেন। প্লেটো, রাস্কিন ও টলস্টয় পাঠে সমৃদ্ধ গান্ধী পশ্চিমি সভ্যতার নেতিবাচক দিকগুলি নিয়ে এই গ্রন্থে যেমন তুলে ধরেন অপর দিকে তেমনি বিকল্প সমাজ-ভাবনার কর্মসূচীর ও (অহিংস) উল্লেখ করেন।

দক্ষিণ আফি কা থেকে ভারতের দিকে রওনা হয়ে কয়েক মাস লন্ডনে কাটিয়ে গান্ধী ১৯১৫ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করা, খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ উদ্যোগের পথ প্রস্তুত করা, ১৯২২ সালে ফে ব য়ারিতে চৌরিচৌরার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধী একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ওই আন্দোলনে অভিযুক্ত গান্ধী জেলে থাকাকালীন 'আত্মজীবনী' বা 'সত্যের প্রতি আমার অনুসন্ধান' রচনা করেন। ইতিমধ্যে 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদনা ও লেখালেখির মাধ্যমে এবং আশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজ দর্শন তথা সমাজসংস্কার মূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সচেষ্ট হন। সমাজ বিষয়ে চিন্তাভাবনায় সমৃদ্ধ 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকাটি অচিরেই জনমানসে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ১৯২৪ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত তিনি মূলত সমাজসংস্কার, অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলন এবং পল্লীপুনর্গঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ১৯৩০ সালের জানুয়ারিতে আইন অমান্যের আহ্বান, মার্চ-এপ্রিলে ডান্ডি লবন যাত্রা, ১৯৩১ এর মার্চে লর্ড আরউইন এর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন, লন্ডনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান, ফিরে এসে ওয়ার্ধার কাছে 'সেবাগ্রাম আশ্রম' গড়ে তোলা প্রভৃতি ঘটনাগুলি গান্ধীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পাশাপাশি সমাজ সংস্কারে অংশগ্রহণের দিকটিকে তুলে ধরে।

১৯৪০-৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাপর্বে গান্ধী পুনরায় ভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। কিন্তু ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে প্রেরিত ক্রিপস মিশনের পটভূমিতে ওই আন্দোলনের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ঘোষণা ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ থেকে গান্ধী নিজেকে সরিয়ে রেখে গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ, বিকল্প উন্নয়ন ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে বক্তব্য হাজির করেন। 'হরিজন' পত্রিকায় তাঁর লেখাগুলি এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে নেহেরু-প্যাটেল, জিন্না, আম্বেদকর ছিলেন অতিমাত্রায় সক্রিয়। ভিন্ন রাজনীতির প্রবক্তা ও কারিগর সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেও গান্ধীর সম্পর্ক ১৯৩০ এর শেষের দিক থেকে ক্রমশ তিক্ত হতে থাকে। ভারত বিভাজন বিষয়ে গান্ধীর প্রবল আপত্তি থাকলেও আগামীদিনের স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ গঠন, ক্ষমতা হস্তান্তর, দেশ বিভাজন প্রভৃতি বিষয়কে তিনি নীরব দর্শকের মতো মেনে নেন। পরিবর্তে তিনি সক্রিয় হয়ে ওঠেন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা প্রশমনে বাংলার নোয়াখালি, বিহার এবং পরে কোলকাতার দাঙ্গায়। ১৯৪৪-৪৭ সময় পর্বে তাঁর প্রথা বহির্ভূত নারী সান্নিধ্য বা বলা যায় নারী হয়ে ওঠার সাধনায় (পুরুষ যেখানে হিংসার প্রতীক, সেখানে নারী অহিংসার প্রতীক; তন্ত্র সাধনার প্রতি তাঁর অনুরাগ, ব হ্মচর্য সাধনার পরীক্ষা) তাঁর ভূমিকা ক্রমশ গান্ধীকে বন্ধু-বান্ধব ও অনুরাগীদের একাংশের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সদ্য স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যাতে সুম্পর্ক বজায় থাকে সেজন্য তিনি পাকিস্তান যাবার সংকল্পও করেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী নয়া দিল্লির বিড়লা ভবনে প্রাত্যহিক প্রার্থনা সভায় চরমপন্থী হিন্দু বলে পরিচিত নাথুরাম গডসের গুলিতে তিনি নিহত হন। এভাবে অত্যন্ত হিংস্র ও জঘন্যভাবে নিভে যায় অহিংস সংগ্রামের এক নায়কের জীবনদীপ।

গান্ধীর সমাজভাবনার সামাজিক ও দার্শনিক ভিত্তি

বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে যে কয়েকজন ভারতীয় মনীষী ঔপনিবেশিক শাসনাধীন পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় লালিত পালিত হয়েও চিন্তা, চেতনা ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে বিকল্প সমাজ (রাষ্ট্রীয় ও পুর) গঠনে প্রয়াসী হয়েছেন, সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেও ভারতীয় সমাজ বিশ্লেষণে বিকল্প সমাজ গঠনে সক্রিয় থেকেছেন তাঁদের মধ্যে গান্ধী অন্যতম। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বা ভূদেবচন্দ্র

মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ না করলেও গান্ধীর বিভিন্ন বক্তৃতায় ও রচনায় ভারতীয় সমাজের ছবি যেমন ধরা পড়ে তেমনি সামাজিক সমস্যাগুলি কিভাবে দূর করা যাবে সে সম্পর্কেও বিকল্প ভাবনার আভাস পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যের শিল্পনির্ভর আধুনিকতাকে অনুসরণ না করে এবং পুরোমাত্রায় রক্ষণশীল না হয়ে বর্তমানের দাবি নিয়ে তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে রত হয়েছেন এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের মাটিতে আধুনিক ভারতকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় ঐতিহ্যের এই পাঠ গান্ধীর একান্তই নিজস্ব এবং সে জন্যই কুসংস্কার বা জাতব্যবস্থাভিত্তিক অস্পৃশ্যতা ও, নারীর অবদমন ভারতীয় ঐতিহ্যের বিরোধী বলেই বিবেচিত হয়েছে। পাশ্চাত্যের শিক্ষার ধারাকেও তিনি ভারতে প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন। পরিবর্তে তিনি শিক্ষাব্যবস্থার নতুন রূপরেখা চিত্রন করেছেন। তাঁর এই চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে যে প্রেক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা দুভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—সামাজিক ও দার্শনিক। এই দুটি আবার পরপর সম্পর্কিত। দর্শন তার রসদ সংগ্রহ করে সমাজ থেকে; আবার সমাজ পরিচালিত হয় কোন না কোন দর্শনকে সামনে রেখে। সামাজিক ভিত্তির মধ্যে রয়েছে পারিবারিক ঐতিহ্য ও ভারতীয় সংস্কৃতি, পাশ্চাত্যের আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি, দক্ষিণ আফি কার অভিজ্ঞতা, তৎকালীন ভারতীয় নব্য শিক্ষিত বিশেষত প্রবাসী ইংল্যান্ড ও আমেরিকাবাসী ভারতীয়দের মানসিকতা প্রভৃতি। দার্শনিক ভিত্তি হিসাবে উল্লেখযোগ্য হয় পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শন ও দার্শনিদের রচনা।

সামাজিক ভিত্তি ঃ

আঠারো ও উনিশ শতকের গোড়ার দিকে যে সমস্ত সামাজিক অবস্থা ও ঘটনা তাত্ত্বিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে ও তত্ত্বরচনায় অনুপ্রাণিত করে সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল ইউরোপে বিশেষত ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব, জ্ঞানদীপ্তি বা রেনেসাঁজনিত সমাজ পরিবর্তন, পূর্বতন ধারণা ও প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তন, পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বিকাশ, তৎজনিত সঙ্কট সাম্রাজ্যবাদের সূচনা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে রোমান্টিকতা, রক্ষণশীলতা, উপনিবেশিত দেশগুলির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তর, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে বাজার দখলের

লড়াই ইত্যাদি। সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষাব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক শোষণব্যবস্থার মধ্যে লালিত উপনিবেশিত দেশের এক সচেতন পরিবর্তনকামী মানুষ হিসাবে গান্ধী উপরোক্ত ঘটনাগুলির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের তত্ত্ব রচনা করেন। আবার, কখনও সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিংবা কখনও সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে এসে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সেগুলির প্রতিকারে অগ্রসর হন।

ইউরোপের সমাজপরিবর্তনে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব এবং ফ্রান্সের রাজনৈতিক বিপ্লব (১৭৮৯ খি ঃ) এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিল্প বিপ্লব পুঁজিবাদের বিকাশ ও বিস্তারকে ত্বরান্বিত করে শুধুমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, পুরাতন সামন্ত-যাজক নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যস্থার রূপান্তর ঘটিয়ে নতুনতর সম্পর্কের প্রেক্ষিতে নতুন সমাজ গড়ে তোলে। ব্যক্তির জীবনবোধেরও রূপান্তর ঘটতে থাকে। নতুন শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব ও নগরসভ্যতার বিকাশ সমাজে যেমন নতুনতর সুযোগ সৃষ্টি করে, তেমনিই নতুনতর সংকটেরও সৃষ্টি করে। ইউরোপের ওই সামগ্রিক পরিবর্তনকে গান্ধী আধুনিক সভ্যতার বিকাশ বলে আখ্যায়িত করেন। পাশ্চাত্য আধুনিক সভ্যতার বিকাশ গান্ধীর মনোজগতে দু-ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তিনি এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন। কারণ, এই পরিবর্তন ব্যক্তিকে মধ্যযুগীয় সংস্কার থেকে যুক্ত করে ব্যক্তিমানুষে রূপান্তরিত করেছে—ব্যক্তির অধিকার, স্বাধীনতা, সাম্য প্রভৃতি ধারণাগুলির জন্ম দিয়েছে, মানুষের ভাগ্যকে ঈশ্বর নির্ধারিত না ভেবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যক্তির প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দিয়েছে, নারীমুক্তির বিষয়টি সামনে এনেছে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই গান্ধী আত্মজীবনীতে একদিকে বি টিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন এবং অন্যদিকে ভারতের পরাধীনতার জন্য ভারতবাসীকেই দায়ী করেছেন।

কিন্তু একই সঙ্গে তিনি ইউরোপের আধুনিক সভ্যতার সমালোচনা করেছেন। কারণ, ব্যক্তি স্বাধীনতা ব্যক্তিকে প্রকৃত স্বরাজ দিতে পরেনি, অধিকারের সঙ্গে কর্তব্য বা সেবাকে যুক্ত করেনি; অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানকে নৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করেনি, অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে আধ্যাত্মিক উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করেনি; নারীর মুক্তিকে মানবিকতার বৃহত্তর প্রেক্ষিতে বিচার করেনি এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মীয় সহনশীলতাকে মেলাতে চায়নি। উক্ত ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে গিয়ে গান্ধী আধুনিক সভ্যতা—শিল্পবিপ্লব বা পুঁজিবাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রভৃতি

১৮২০ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত সময়ে অর্থাৎ রামমোহন থেকে গান্ধী নেতৃত্বের সূচনা পর্যন্ত ভারতীয় সমাজে বি টিশ শাসন ও সভ্যতা কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভিখু পারেখ চার ধরনের প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করেন (পারেখ, ১৯৯৫ ঃ ১৮২১, ১০৩-১০৪)। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সনাতনপন্থী নেতৃবৃন্দ যাঁরা বি টিশ শাসনের প্রতি ছিলেন একরকম উত্তাপবিহীন ও উদাসীন। দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে ছিলেন হতাশ এবং ইউরোপীয় ধাঁচে ভারতীয় সমাজগঠনের স্বপ্ন দেখতেন। ওই ধারাকে আধুনিকপন্থী ডিরোজীও গোষ্ঠী বলা হয়। আর এক ধরনের নেতৃবৃন্দ ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এই ধরনের নেতৃবৃন্দকে (রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, গোখেল প্রমুখ) 'সমালোচনাধর্মী আধুনিকতাবাদী' নামে অভিহিত করা যায়। সনাতনপন্থীদের একাংশ 'যা কিছু পুরাতন, তার সবকিছুই ভালো'—এই আপ্তবাক্যকে মেনে না নিয়ে ইউরোপীয় সংস্কৃতির ইতিবাচক দিকগুলিকে প্রয়োজনবোধে কাজে লাগিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যকে পুনরুদ্দীপিত করতে চেয়েছেন। এই ধরনের নেতৃবৃন্দকে পারেখ সমালোচনাধর্মী সনাতনপন্থী' বলে উল্লেখ করেছেন। ভিখু পারেখের মতে, গান্ধী হিন্দু ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে চেয়েছেন ঔপনিবেশিক শাসনের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে, কিন্তু একইসঙ্গে তিনি সচেতন ছিলেন যে, ভারতীয় ঐতিহ্য এমন বেশ কিছু মৃত জিনিস বহন করে চলেছে যা অচেতনভাবে বা অন্ধভাবে অনুসরণ করা অযৌক্তিক এবং অসম্ভব। সেই সময়কার যুক্তিবাদী আন্দোলনগুলি যাতে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে, সেজন্য ঐতিহ্যকে পুনর্নির্মাণ করা দরকার। বলাবাহুল্য— হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য (শৈশবে মা ও ধাইমার প্রভাব), ধর্মীয় সহনশীলতা (মাতৃকুলের পারিবারিক ঐতিহ্য এবং স্বগৃহে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষের যাতায়াত ও আলাপচারিতা) নারীমুক্তির বিষয় (যা মায়ের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাবশত জন্ম নিয়েছে) প্রভৃতি বিষয় তিনি পারিবারিক সূত্রেই লাভ করেছিলেন। সমকালীন আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে পরিণত গান্ধী সেই ঐতিহ্যকেই পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন।

Scanned with CamScanner

অস্পৃশ্যদের উন্নতি করার জন্য মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা :

মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। গান্ধীজী 'হরিজন' শব্দটির প্রচলন করে গেছেন। যার অর্থ "ঈশ্বরের লোক" — দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণ নেতৃত্বের কাছে প্রথম এই সমস্যা ছিল। গান্ধীজীর মতে "অস্পৃশ্যতার অভিশাপ" একটি পাপ ছিল। তিনি অস্পৃশ্যতা নির্মূল করতে ও নিপীড়িত লোকেদের উন্নয়ন করার জন্য তাঁর জীবনের বেশির ভাগ কাটিয়েছিলেন। মানবজাতির দাস হিসাবে তিনি প্রচার করেছিলেন যে, সমস্ত মানুষ সমান এবং তাই হরিজনদেরও অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর পাশাপাশি সামাজিক জীবনের অধিকার আছে।

গান্ধীজী সমষ্টিগত বিভেদের অবসানের জন্য আন্দোলন করেছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর মতানুসারে জাতি-প্রথার উৎপত্তি ধর্মের সাথে সম্পর্ক-রহিত। তিনি জাতিভেদ প্রথা পাপ হিসাবে অভিহিত করেছেন। তিনি দাবী করেন এই প্রথার উৎস সম্পর্কে অবহিত নন এবং জাতি প্রথার উৎস অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বলেও তিনি মনে করেন না। তাঁর মতে বর্ণ ও আশ্রম হল প্রতিষ্ঠান, জাতি-প্রথার সাথে বর্ণাশ্রম সম্পর্ক রহিত, বর্ণব্যবস্থা হিন্দুধর্ম আমাদের দারিদ্র্য-সচেতন করে তোলে। এই প্রথার অন্যতম সমস্যাই — ছিল, অস্পৃশ্যতা এবং দুর্ভাগ্যক্রমে সমাধানের অভাব। বর্ণাশ্রম প্রথার বিলোপে কোনও অস্পৃশ্যতা স্থান পায়নি।

গান্ধীজী হিন্দু সমাজের চারটি বর্ণ বিভাগ মানতেন। তিনি অস্পৃশ্যদের শূদ্র বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে দেখেছেন, এবং তাঁর মতে সব পেশা সমান। তিনি বিভিন্নভাবে হিন্দু সমাজে সংস্কার করেন। তিনি একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে একটি জাতি মানুষের পেশাগত মর্যাদা একটি সার্থক মৌলিক পরিবর্তন আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি অস্পৃশ্যদের নিজেদের মুক্তির প্রতি মানুষের আহ্বান করে, সমাজের তাদের মধ্যে স্থান দেন তাদের ঈশ্বরের সন্তান "হরিজন" যে শব্দটি তাঁর প্রতিষ্ঠিত, অস্পৃশ্যতা নিবারণ করতে হবে। গান্ধীজীর হরিজনদের প্রতি গভীর সহানুভূতি ছিল। তিনি বলেছেন যে আমি পুনর্জন্ম চাই না কিন্তু যদি আমার জন্ম হয় তবে আমি যেন অস্পৃশ্যদের ঘরে জন্মগ্রহণ করতে চাই। যাতে আমি তাদের দুঃখ দূর করে দিতে পারি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে হিন্দুদের হৃদয় পরিবর্তন করতে হরিজনদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্প্রীতি স্থাপন করতে অপরিহার্য ছিল। তিনি তাদের সামাজিক দুর্দশার জন্য সব থেকে বেশি চিন্তিত ছিলেন এবং তাদের এ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করে-ছিলেন আন্দোলন শুরু করেন।

গান্ধীজীর রাজনৈতিক ভূমিকা :

ভারতের সক্রিয় রাজনীতির নেতা গান্ধীজী হরিজনদের অস্পৃশ্যতা ও বৈষম্যের ভয়াবহতা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। 1919 সালে গান্ধীজী ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রবেশ করেন। 1920 সালে থেকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার এবং সংগ্রামের সাথে অন্যদিকে অস্পৃশ্যতার অব--সানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন, 1920 সালে তিনি খেলাফতের সাথে অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণকে কংগ্রেসের দ্বিতীয় বা প্রথম স্থান দিতে হয়।

গান্ধীজী ব্রিটিশ নীতি "বিভাজন ও শাসন"-র বিরুদ্ধে ছিলেন, তিনি হরিজনদের হিন্দুদের থেকে আলাদা করার ব্রিটিশ নীতির

তীব্র নিন্দা করেছিলেন, তাই হরিজনদের পৃথক ভোটাধিকার দেওয়ার ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তিনি আমরণ অনশন (ঘোষণা) করে বলেন, "হিন্দুদের থেকে অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্ন করাটা এক আত্মঘাতী হবে"। গান্ধীজী লন্ডনের দ্বিতীয় গোল টেবিল সম্মেলনের (Round Table Conference) সংখ্যালঘু কমিটিতে ঘোষণা করেছিলেন (1932) "আমরা চাই না যে অস্পৃশ্যদের পৃথক শ্রেণি হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হোক, শিখ মুসলমান ও খ্রিস্টান চিরকাল থাকতে পারে। কিন্তু তিনি চাইতেন না অস্পৃশ্যরা চিরকাল আলাদা হয়ে থাকুক। তিনি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।

গান্ধীজীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অস্পৃশ্য শ্রেণীদের পৃথক

আমরা প্রধানের সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে ; সত্য তারা তাদের নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবে এবং ভোট দেবে, এর সাথে তারা সাধারণ নির্বাচনেও ভোট দিতে পারবে। এই "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার (communal award) প্রতিবাদে গান্ধীজী আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত নেন, 1932 সালে হরিজন নেতাদের সঙ্গে আলোচনা হয় এবং তাদের সাথে সমঝোতা স্বাক্ষরিত ঠিক হয় যে, জনসাধারণের জন্য, শুধু হিন্দুদের আসনের বদলে অধিকার সংখ্যা নির্ধারিত আসনটি দেওয়া হবে। হরিজন আন্দোলন সারা দেশে ব্যাপক প্রচার করে। গান্ধী এই আন্দোলনের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের জন্য সারা ভারত ভ্রমণ করেন।

২০শে সেপ্টেম্বর, 1932 গান্ধীজী অনশন শুরু করেন। অবশেষে 24শে সেপ্টেম্বর 1932 সালে বিখ্যাত পুনা চুক্তিতে গান্ধীজী ও আম্বেদকরের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়, দলিত সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই চুক্তি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রস্তাব সংশোধন করা হয়। পরবর্তীকালে 1935 সালে ভারত শাসন আইনে পুনা চুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ** (Last Pa

1937 সালে গান্ধীজী ও কংগ্রেস নির্বাচনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-কারী সকল কংগ্রেসের প্রার্থীদের – অস্পৃশ্যতা সম্পর্কিত এবং – অস্পৃশ্যদের আশ্বাস দেন। গান্ধীজীর নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়ের পরিপ্রেক্ষিতে 1931 সালে প্রথম হিন্দু নারী প্রধান গঠিত হয়।

এতে বলা হয়, "সকল সামাজিক ব্যক্তি, ধর্ম, জাতি আইন সমান হবে। 1938 সালের, সিভিল নিষিদ্ধ করার ডিসঅ্যাবিলিটিস অ্যাক্ট (Civil Disability act) অস্পৃশ্যদের অবস্থার আরও আইন অধিকারের জন্য গৃহীত হয়েছিল, যা প্রকাশ করে যে কোনও সামাজিক বা ধর্মীয় প্রথার সুবিধার অধিকার থেকে হরিজনদের বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এই আইনের মাধ্যমে মাদ্রাজ প্রদেশে আইনসিদ্ধ মাধ্যমের মন্দির প্রবেশ হয়। 1939 সালের মাদুরাই-মীনাক্ষী হরিজনদের প্রবেশ ঘোষণা হয়। এই ভাবে গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলন সরকারি ভাবে অস্পৃশ্যতা নিবারণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ এবং সকল হরিজনদের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়।

করা হয়। তাঁর নির্দেশে ও: মনোরোগীদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তিনি হাসপাতালে শিকড় খোলা হিসেবে জেলখানার মনোরোগীদের সোপানক্রম খুলে এবং বারান্দায় সংস্কার করা হয়েছে।

হাসপাতালের অন্যান্য এবং মনোবিজ্ঞানীর প্রস্তাব গুলি নিম্নরূপ :—

1. যখন নিরাপদে হাসপাতালের দায়িত্ব কর্মী করে তাও অবশ্যই সকলের চিকিৎসার সাথে হাসপাতালের সেবা করতে পারবে।

2. পরিচ্ছন্নতা, আলো-বাতাস এবং সুস্বাস্থ্য অবস্থিত হাসপাতালের সাথে সচেতনতা তৈরি করা উচিত।

3. রোগীর নিজের সামর্থ্যের বাইরে কাজ করার অভ্যাস বন্ধ করা আবশ্যক।

হরিজন কল্যাণমূলক কাজে গান্ধীজীর ভূমিকার সাফল্যতা :

গান্ধীজী শুধু স্বদেশ নন, তিনি প্রচারে অস্পৃশ্যদের সঙ্গ করেছেন, তিনি হরিজনদের সাথে বসবাস করেছেন, তিনি হরিজনদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চিন্তাভাবনা করেছেন এবং উচ্চবর্ণের মানুষদের সাথে তারা যাতে সমান মর্যাদা অর্জন করতে পারে সে ব্যাপারে বিশেষ নজর দেন। তিনি বিভিন্ন হিন্দু মন্দিরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আইন প্রণয়নের জন্য লড়াই করেছিলেন। তিনি হরিজন নামক পত্রিকা রচনা এবং অন্যদের জন্য প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার জোরালো প্রচেষ্টা ও ১৯ সুপারিশের ফলে অস্পৃশ্যতাকে ভারতীয় সংবিধানের অধীনে আইনত নিষিদ্ধ

4. আমাদের দলিত সমাজ ও পশ্চাদপদ সমাজের জন্য ছাত্রবৃত্তি - ব্যবস্থা করা হবে।

5. মেধাবৃত্তি - অনুশীলনের অভিভাবক সব দিক করা প্রয়োজন।

6. শিক্ষকদের অধিকারের সামাজিক এবং সরকারি করা প্রয়োজন।

7. কম সময়ে বেশি ছাত্র, উপযুক্ত সংখ্যায় যুক্ত শিক্ষকদের এবং নিয়োগ করা।

8. শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা দেখা হবে এবং স্বচ্ছ - নিরপেক্ষ নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করা উচিত।

9. শিক্ষকদের ন্যায্য বেতন অবশ্যই দিতে হবে।

3.1.2 Eradication of Social Evil

a. Untouchability

While addressing the question of social equality, Gandhi created a distinction between untouchability or outcasteness, caste and "*Varnas*". The existence of untouchability among Hindus could be a denial of the philosophy of gospel on that we have a tendency to pride ourselves. We have a tendency to area unit accountable for the evils among the 'untouchability'. [26] He was systematically and uncompromisingly against the primary since his childhood itself. Terribly compliant towards his "love of peoples fetched the objects of untouchability early into my life. My mother aforesaid, 'you should not bit this boy, he's untouchable'.[27] 'Why not' I inquired back, and from that day, my rebellion began." This revolt became stronger &stronger with the passage of your time, most in order that on occasions, he staked even his married life in his fight against untouchability. As he has clarified, "I was get married to the work of the extinction of untouchability long before I used to be wed to my spouse. There have been twice in our joint life once there was a selection between operating for the untouchables and remaining with my spouse, and that I would have most well-liked the first". In 1946, he had declared that no wedding would be celebrated in the Sevagram Ashram if one amongst the parties were an impervious by birth.

He commands that untouchability was a hindrance not solely to the march of Hindus towards their own smart, however conjointly to the final smart of all. He rejected that untouchability and a spiritual, scriptural sanction, and notwithstanding it had, he refused to honor and live by that sanction. So as to catch up on the follow of untouchability by his fellow-beings, he desires to be regenerate as an *"atishudra"*. He has expressed all this with alone force and clarity in these words: "In addressing the monster of untouchability, my innermost need isn't that the brotherhood of Hindus solely could also be achieved, however it basically is that the brotherhood of man could also be realized. Untouchability could be a device of spiritual being who quotes scriptures in his favor; it's an easy overzealous obstinacy to act persecuting man within the sacred name of faith. Scriptures cannot transcend truth and

reason. It's blasphemy to mention that God set apart any portion of humanity as untouchable. That faith which nation is destroyed of the face of the world that pins religion to injustice, untruth, and violence. The correspondent doesn't question the duty of serving the 'untouchables'. However areas unit we have a tendency to serve them if their terribly sight offends and pollutes us? [28] I'd like quite that Hinduism expired, untouchability be alive. I think that an untouchability is not any a part of Hinduism; it's rather its excrescence to be removed by each effort; it's a scourge that it's the obligatory duty of each Hindu to combat. If I even have to be regenerate, I ought to change state as untouchable, or *"atishudra"*. The reason behind untouchability is as expensive to ME as life itself. I will be able to not cut price away untouchables' rights for the dominion of whole world".[29]

Gandhi remained stormily and persistently wed to the reason behind the removal of untouchability notwithstanding it immersed the renunciation of his spouse and spiritual religion. He wont to say that Hinduism was a region of his being or existence, however if he ever felt that it extremely countenanced untouchability, he would don't have any hesitation in renouncing Hinduism. Still the caste Hindus who recognizes that untouchability could be a blot on Hinduism should catch up on the sin of untouchability. Whether, therefore, *Harijans* need temple entry or not, caste Hindus got to open their temples to *Harijans*, exactly on an equivalent terms because the different Hindus. For a caste Hindu with any sense of honors, temple prohibition could be a continuous breach of the Pledge taken at the metropolis meeting of Gregorian calendar month last. Those, who gave their word to the globe and to God that they'd have the temples opened for the *Harijans*, got to sacrifice their all, if need be, for redeeming the pledge. It's going to be that they failed to represent the Hindu mind. They have, then, to possess defeat and do the correct penance. Temple entry is that the one non secular act that might represent the message of freedom to the untouchables and assure them that they're not outcastes before God.[30]

Untouchability:
অস্পৃশ্যতা : গান্ধীজীর চিন্তা

১। হিন্দু ধর্মে যে অস্পৃশ্যতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা নিয়ে হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণদের মধ্যে যথেষ্ট গর্ব ছিল — কিন্তু আসলে তা এটি সমাজের একটি কুফল। (কালো দিক)

২। গান্ধীজী অনেক ছোটবেলা থেকেই এই অস্পৃশ্যতার বিরোধের বিরুদ্ধে ছিলেন। মানুষে মানুষে বিভেদ তিনি ছোট বেলা থেকেই মেনে নিতে পারেন নি।

৩। গান্ধীজী মনে করতেন যে আমাদের সমাজের অগ্রগতির পথে হিন্দু ধর্মের এই অস্পৃশ্যতা হলো এক বিশেষ ধরনের প্রতিবন্ধকতা / বাধা।

৪। অস্পৃশ্যতা হলো সমাজের হিংসা, অনৈতিকতা এবং অসত্যের প্রতীক রূপ।

৫। তাই গান্ধীজী এই অস্পৃশ্যদের 'হরিজন' নাম দিয়ে তাদের সাম্য, ঐক্য এবং স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন।

গান্ধীজী ও অস্পৃশ্যতা —

1933 সালের নভেম্বর মাস থেকে 1934 সালের আগস্ট পর্যন্ত গান্ধীজী অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এক বিশেষ লড়াই চালায়। তিনি যে হরিজন সেবক সংঘ নামে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন, তার মূল মন্ত্র ছিল অস্পৃশ্যতাকে দূর করা। এই সংগঠনের আর্থিক উন্নতির জন্য তিনি পায়ে হেঁটে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন, এমনকি দেশের সমস্ত অন্যান্য কর্মীদের কাছে তিনি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলনে যোগদান করার জন্য আবেদন জানান।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ কর্মসূচী ও আন্দোলনে গান্ধীজীর প্রধানত অবস্থান, নিম্ন বর্ণের হিন্দু সমাজে হিন্দু ধর্মের ২য়: তিনি নিজেকে অস্পৃশ্য ও হরিজন বলে অভিহিত করেন, এবং তাদের অন্তর্ভুক্তির মন্দিরে দেবতার সামনে প্রার্থনা করেন।

গান্ধীজী বলেন যে যেই হিন্দু শাস্ত্রে অস্পৃশ্যদের অপমান করা হয়, সেই হিন্দু ধর্ম তিনি গ্রহণ করতে পারেন না, কেবলমাত্র সমাজের অস্পৃশ্যদের উপর অত্যাচার যেমন ঈশ্বর কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করার মতো ভয়ঙ্কর অপরাধ।

জীবনে অনেক কষ্ট সহ্য করেই গান্ধীজী অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর বিরূপ মত প্রকাশ করেন, 1905 সালে প্রথম গান্ধীজী বলেন যে তাঁর প্রেম ভালবাসা ও অস্পৃশ্যতার অভিশাপ, অস্পৃশ্যদের দুঃখ দূর করা উচিত, কেউ মানুষের নীচ থেকে দেখা উচিত নয়। 1909 সালে তিনি সর্বসম্মুখে বলেন যে জাতিভেদ প্রথার বিরোধী তিনি, তাঁর মতে উচ্চ ও নীচু এই দুটো আলাদা কিছু হয় না।

Sem (2) Hons:

গান্ধীজী ও অস্পৃশ্যতা Contd.

গান্ধীজী সার্বিকভাবে জাতিগঠন যজ্ঞে কাজ শুরু করেন কারণ তার মূল লক্ষ্য ছিল অস্পৃশ্যতার কুপ্রথা বিলোপ করা, তাই অস্পৃশ্যতা দূর করে তিনি সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা নিয়ে কংগ্রেসকে সামনে রাখার চেষ্টা করেন।

অনেক কম বয়স থেকেই অস্পৃশ্যদের দিক-এর অত্যাচারের বিরুদ্ধে গান্ধীজী সোচ্চার হন, ছোটবেলার থেকেই বয়স সমস্ত জাতিভেদ প্রথার অবসান করে তিনি নিজের মত যান। South Africa তে গিয়েও তিনি এই মনোভাব বজায় রাখেন এবং সমস্ত জাতি ধর্ম বর্ণের মানুষদের সেখানে তাদের সঙ্গে ওঠা বসা খাওয়া দাওয়া শুরু করেন।

তিনি ওনার নিজের পরিবার ও বন্ধুদের সাহায্যে এই অস্পৃশ্যতা বিরোধীতার বিষয়টি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দুঃখ পেতে হল, কিন্তু নিজের নীতি ও বিশ্বাস থেকে তিনি কখনোই সরে আসেননি। 1915 সালে সবরমতী আশ্রমে এক অস্পৃশ্য পরিবারকে তিনি

16:39 • Vo)) LTE1 4G Vo)) LTE2 78%

You
26/04/22, 12:21

নিজের সত্যাগ্রহ আন্দোলন বাতিল ঘোষণা করেন, কিন্তু
এর পরিপ্রেক্ষিতে অনেক শ্রদ্ধা দেশের চিত্ত-রঞ্জন
উপর আস্থা আর্থিক [illegible] নিতিনি, তাঁর
বাবার সহায়তায় [illegible] [illegible] দিন, এই [illegible]
পরবর্তীকালে তিনি (সরস্বতী) [illegible] এবং [illegible]
নিজের আশ্রম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন

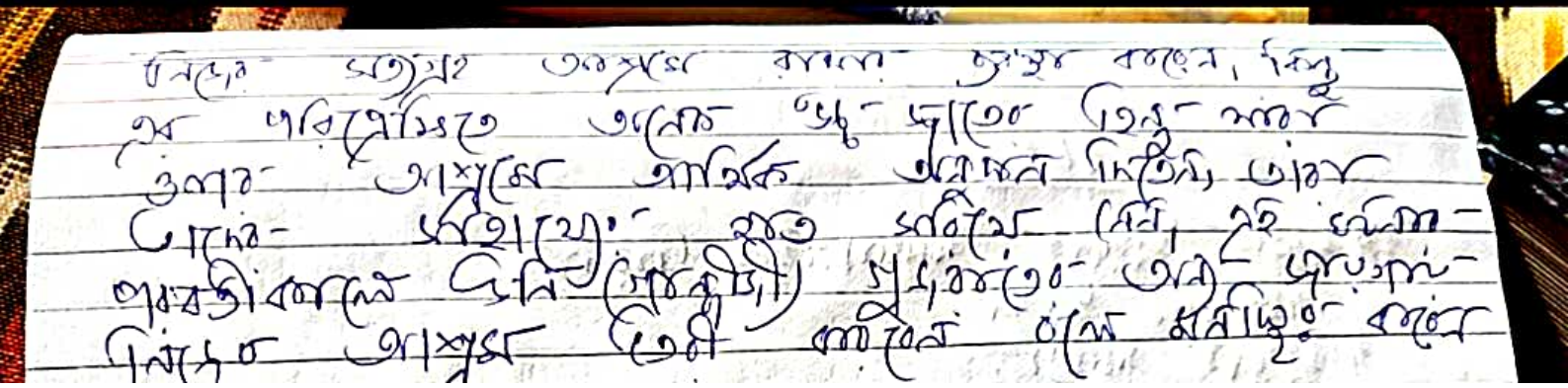

ঘ/

Contd Sem (2) Hons

গান্ধীজী ও অস্পৃশ্যতা

নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজের মধ্যেও গান্ধীজীর দুই ধরণের বিরোধী মনোভাব তৈরী করে দেয় দেখে। গান্ধীজী দুই হিন্দুই নিজ দুর্গ ও দলিত সমাজের নিজের মাধ্যমে, তিনি নারী আর একটি অস্পৃশ্য কথার প্রবর্তন করেন দিনে প্রচলিত হোলোর উদ্দেশ্যে তার নিজ 2 দিন, এছাড়াও অস্পৃশ্যদের মন্দিরে প্রবেশ নিশ্চি- কার্য তিনি নিয়েও কথা বলেছেন — সেই সময় তার ক্ষেত্রে সমিতির কাছে নিজের কথা, তাই পরে হয় দুই ক্ষেত্রে হিন্দুদের তিনি বিশেষ ভাবে কল্পিত করার চেষ্টা করেন, গান্ধীজীর আশ্রমে জীবন যাপন দুর্গ ও দলিত বিভাজন করা হত না।

গান্ধীজী মনে করতেন যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের মধ্যে দিয়ে সমাজের সোনার যুগ প্রতিষ্ঠিত অর্জন করা সম্ভব হবে। তাই তিনি ভারতের চেষ্টা করেছেন ঐক্য স্থাপনের হিন্দুদের মধ্যে এই চেতনা জাগাতে 1904 [illegible]

যে অস্পৃশ্যতার নিপীড়িত করার প্রথা তাকে যদি সম্পূর্ণ রূপে বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেতে হয়, এর জন্যে তিনি রাজী আছেন।

গান্ধীজী তাঁর সময়ে বিশেষ নিম্ন জাত ও বর্ণ মানুষকে সমাজের সামনে উঁচুতে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। অম্বেদকরের আন্দোলন খুব জোরদার অনেক আগে থেকেই গান্ধীজীর আন্দোলন দেশে চলছিল। তিনি তাঁর আশ্রমে সমস্ত নিচু জাত হিন্দুদের অস্পৃশ্যদের বিরুদ্ধে কাজ করা প্রথা দূর করেন। তিনি চেষ্টা করেন যাতে অস্পৃশ্য নিপীড়িত তাদের নিচু জাত হিন্দুদের সমান অধিকার সুযোগ পায় এবং সমাজে অস্পৃশ্যদের মানসিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

কিন্তু গান্ধীজীর হরিজন বা অস্পৃশ্য আন্দোলনের প্রধান সমস্যা এই ছিল যে উচ্চ জাতি লোকেরা নিচু বর্ণ মানুষের নিপীড়িত না করে আন্তরিকভাবে তিনি কেবল তার অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের চেষ্টা করেন, তাই হলো এই আন্দোলনের তার সঠিক রূপ হারিয়ে ফেলে।

Core (Hons)

Topic

প্র: ড. বি. আর. আম্বেদকর কেন হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন?

উ: ৬ই ডিসেম্বর ডঃ আম্বেদকর পরলোকগমন করেন, তার ঠিক মাত্র দুমাস আগে তিনি জীবনের চরম একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, হিন্দু ধর্মকে ত্যাগ করে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন, এই সিদ্ধান্তকে বৈপ্লবিক বলা যুক্তি - যে তখন জীবনে পরিবর্তন আসে এমন নয়, এটি হলো উনার আত্মমর্যাদাবোধ দ্বারা ঠিক বহু-কালের সমগ্র হিন্দু ধর্মের অবিচার অনাচার থেকে মুক্ত হয়ে নতুন ধর্ম খুঁজে বৈপ্লবিক সাহস পায়।

হিন্দু ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা হয়ে যখন আম্বেদকর বৌদ্ধ ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হন সেই ধর্ম গ্রহণ করবেন বলে ঠিক করেন, যেমন ১৯৩৫ সালে একটি সভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি ঘোষণা করেন যে ধর্মের এই পরিবর্তন তার কাছে তখনও প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। অস্পৃশ্য প্রতিটি মানুষের স্বার্থে প্রয়োজন হলো স্বাধীনতা যা নিশ্চিত নয় হিন্দু ধর্মে থেকে কোনভাবেই

হুদে বিপ্লব শুরু হয়, অর্থাৎ 1956 সালের ২৪ই অক্টোবর
তাদের প্রথম শান্তিপূর্ণ মিছিলে অনুমতির সাথে
নিয়ে আন্দোলন বাসভবনের দীর্ঘস্থায়ী [illegible] এক
সর্বোচ্চ অনুমোদিত ভাবে বিপ্লব শুরু করেছিল,
এই ঘটনাটি ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে
চিহ্নিত হয়। মুক্তি এবং আন্দোলনের দাবি বিস্তৃত হয়েছে,
তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এদের অনুসারী তাদের স্বাধীনতা
বিসর্জনের [illegible] থেকে বেরিয়ে আসতে রাজী হয়।

8/5 Sem (2) Hons

উত্তর

Dr Ambedkar এর হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করার বিষয় আলোচিত হয়েছে যে তিনি অস্পৃশ্য হিসেবে জন্ম নিয়েছিলেন এবং হিন্দু ধর্মের মধ্যে থেকে অস্পৃশ্যদের মুক্তি সম্ভব নয় বলে তিনি এক নতুন ধর্মের খোঁজ করতে থাকেন। তিনি মনে করতেন যে হিন্দু ধর্মে জাত পাতের নিয়ম রয়েছে এবং যে কারণে তিনি কখনো সমান মর্যাদা পাবেন না। সেখান থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন।

1935 সালে নাসিকের একটি সভায় আম্বেদকর ঘোষণা করেন যে হিন্দু হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেও হিন্দু হয়ে তিনি মরবেন না, অর্থাৎ তিনি হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করবেন। তার মতে হিন্দু ধর্ম অস্পৃশ্যদের জন্য সমান অধিকার দেয় না এবং অস্পৃশ্যদের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে না।

এই 1935 সালের ঘোষণার পর থেকে প্রায় কুড়ি বছর ধরে আম্বেদকর বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে পর্যালোচনা করেন। এই সময়কালে তিনি অনেক আলোচনা করেন। শিখ ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা করেন এবং ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্ম নিয়ে [illegible] আলোচনা করেন। এর মধ্যে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার আগে তিনি [illegible] করতে থাকেন। বুদ্ধের জীবনদর্শন তাকে আকর্ষণ করে, সেই কারণে নিজেকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন।

Sem 2 (Hons)

উঃ

1956 সালে Ambedkar যখন বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন তখন তিনি মনে করেন আধুনিক যুগের এই বিশ্বকে কল্যাণ যে বৌদ্ধ ধর্মই হলো সব থেকে বিশুদ্ধ ধর্ম। এই ধর্মের মধ্যে কিছু বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা রয়েছে, যার মাধ্যমে মানুষ নৈতিক নীতিগুলি অনুসরণ করে সমস্যাগুলোর কিছু উন্নতির চেষ্টা করতে পারে।

হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করা আছে যে কিভাবে মানুষ নিজের জীবনে নিজেকে উন্নতি করবে। কিন্তু Ambedkar এর মতে বৌদ্ধ ধর্মে এই বিষয়টি স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে কি করে মানুষ নিজের জীবনের সততার মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। এই ধর্মটি মানুষকে উন্নত হতে ও কষ্ট থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। এছাড়া হিন্দু ধর্মে

হিন্দু ধর্মানুমোদিত বিধিনিষেধ থেকে নিজেকে মুক্ত করে Ambedkar বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে তার জীবনের চরিত্র অস্পৃশ্যতা ও অস্পৃশ্যদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখাতে চেয়েছেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পরে দুঃখের কথা Ambedkar সারাজীবন প্রতিবাদীভাবে ছিলেন, মৃত্যুর পর তিনি যার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অনুগামী জীবনের চরিত্র এবং মূল্য দিল।

এই ভাবে দলিত সমাজের প্রেরণার্থে দলিতদের এক নতুন দিশার মুক্তি পায় যাতে নতুন পরিচয় সম্প্রদায়ের প্রতিবাদের প্রেরণাদায়ক হতে সাহায্য করে, বিশেষ করে তাদের জীবনে ~~xxxx~~ এখন এই জীবন থেকে একটা বিচ্ছিন্ন হয়, সম্প্রদায় সমাজে নিজেদের অধিকার নিয়ে প্রতিবাদ করার শক্তি তৈরী হয়,

এই বলা যায় যে আম্বেদকরের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে দলিত এক সমাজের ছবি তিনি তৈরী করে গেছেন যেখানে দলিতদের প্রত্যেক জাতির থেকে মুক্ত হয়ে এক জাত তৈরি হয়েছে না,

বি. আর. আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬)

ড. অনিরুদ্ধ চৌধুরী

ভূমিকা

নিম্নবর্গের আরও বিশেষভাবে বলতে গেলে দলিত সমাজের একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে। উচ্চবর্গের চেতনার ছকে ফেলে একে সঠিক ভাবে অনুধাবন করা খুব কঠিন। ভারতীয় সমাজের প্রান্তিক অংশের মানুষ যুগ যুগ ধরে নিদারুণ দারিদ্র্য, বঞ্চনা, অস্পৃশ্যতার শিকার। উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিতে এঁরা 'অপর' বা 'আদার'। এই 'অপর' বা 'আদার' অংশের কণ্ঠস্বর ছিলেন ভীমরাও রামজী আম্বেদকর। 'অস্পৃশ্য জাত' হিসেবে পরিগণিত অতি দরিদ্র এক মাহার পরিবারে ১৮৯১ সালের ১৪ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন আম্বেদকর। নিচু জাতের সন্তান হওয়ার জন্য শৈশবকাল থেকেই প্রতি পদে তাঁকে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হতো। বর্ণ-বৈষম্যের অভিশাপে অভিশপ্ত ছিল তাঁর জীবন। শোনা যায়, নিচু জাতভুক্ত হওয়ার কারণে ছাত্রজীবনের শুরু থেকেই বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে তাঁর প্রবেশাধিকার ছিল না। কক্ষের বাইরে থেকে তাঁকে শিক্ষকদের পাঠদান শুনতে হতো। কথিত আছে, একদিন তিনি ভাইকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর দুই ভাইয়ের কথোপকথন শুনে চালক বুঝতে পারে তারা মাহার সম্প্রদায়ের। চালক গাড়ি থামিয়ে তাদের দুই ভাইকে নেমে যেতে বলে। এই মাঝপথে নামিয়ে দিলে নানা সমস্যা হবে বলে দুই ভাইয়ের অনুরোধে কোনও কাজ হয় না। চালক কাছের জলাশয়ে গাড়ি নিয়ে গিয়ে গাড়ির পবিত্রতা ফিরিয়ে আনার জন্য পুরো গাড়ি ধোয়ানো শুরু করে। এই ধরণের ঘটনায় আম্বেদকরের ছোট বয়স থেকেই বেদনাক্লিষ্ট বিভীষিকাময় জীবনের ধারণা পাওয়া যায়। তবে তাঁর অন্ধকারাচ্ছন্ন শৈশবকালের মধ্যে আশার আলোর রূপোলি রেখাও খুঁজে পাওয়া যায়। পাঁচ বছর বয়সে মাকে হারালেও বাবা ও পিসির কাছ থেকে স্নেহ ও শাসন দুটোই পেয়েছিলেন। বাবা নিজে অনেক বছর সৈনিক স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন সন্তানদের ভবিষ্যৎ উন্নতির একমাত্র

সোপান শিক্ষা। পিতার সবচেয়ে বেশি নজর ছিল সন্তানদের শিক্ষার ওপর। মহা
জ্যোতিরাও ফুলের প্রভাব ছিল আম্বেদকরের পিতার ওপর। তিনিও মনে করতেন
দলিতদের বর্তমান অবস্থার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীনতা।
বড় ছেলে আনন্দ এবং ছোটো ছেলে ভীমরাওয়ের প্রকৃত শিক্ষা, যুক্তিবোধ
চরিত্রগঠনের লক্ষ্যে তিনি ছিলেন অনলস। মাতারার সৈনিক ছাউনি স্কুলে
ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দুই ভাইয়ের শিক্ষাগ্রহণ চলতে থাকে। এই স্কুলের দুই
পেডেসে এবং গুরু আম্বেদকরের ভূমিকা তাঁর জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর
দুই 'উচ্চবর্ণে'র শিক্ষকের অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা, মানবিক ব্যবহার এবং
শিক্ষা ভীমরাওয়ের জীবনবোধে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে। সামাজিক
বৈপরীত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা জন্মায়।

ভীমরাওয়ের পরিবার বোম্বাইতে স্থানান্তরিত হলে তিনি এলফিনস্টোন স্কুলে
হয়। এই স্কুলের অধিকাংশ পড়ুয়াই ছিল উচ্চবর্ণের। অনন্যসাধারণ মেধার
ভীমরাওয়ের জাত পরিচয় জানাজানি হতেই তাঁকে প্রায় প্রতিদিন এখানে
অপমানের মুখোমুখি হতে হয়। তাঁর ক্রমশ পরিণত মন বুঝতে পারে আশপাশের
প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতা তাঁকে জয় করতেই হবে। পড়াশুনোয় তাঁর আগ্রহ আরও
পেল। ১৯০৭ সালে ভীমরাও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করলেন। এক
জাতভুক্ত' ছাত্রের কৃতকার্য হওয়ার মধ্যেই ছিল যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস। ভীমরাওয়ের
সাফল্য সবার নজরে পড়ল। তাঁর সম্মাননায় সেইসময় বোম্বাইতে একটি
সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ রায়বাহাদুর সিং, বিশিষ্ট
কে. এ. কেস্টসকরের মত বিদ্বজ্জনেরা। তাঁরা ভীমরাওয়ের পরবর্তী উচ্চতর
জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি এলফিনস্টোন কলেজেই স্নাতক
হন। এলফিনস্টোনে মূলে এবং অ্যাভারসন নামের দুই বিশিষ্ট অধ্যাপক
বিশেষভাবে সাহায্য করেন। ১৯১২ সালে ভীমরাও স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন।

পরিবারের চরম অর্থ সংকট সত্ত্বেও পিতা রামজী চাইছিলেন ভীমরাও
পড়াশুনো করুক। ভীমরাও চাইছিলেন চাকরী করে বাবার পাশে দাঁড়ানোর
উচ্চতর পড়াশুনো চালিয়ে যেতে। তিনি শুনেছিলেন বরোদার মহারাজা
বিদ্যোৎসাহী। তিনি বরোদায় চাকরী করতে চলে যান। অল্প কিছুদিনের
গুরুতর অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁকে বোম্বাই ফিরতে হয়। ভীমরাওয়ের পিতা
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অল্প বয়সে মাকে হারিয়ে বাবা রামজী-ই ছিলেন
আম্বেদকরের জীবন জুড়ে। তাঁর মৃত্যুতে ভীমরাও অনেকটাই নিঃসঙ্গ হয়ে

বরোদার মহারাজা তাঁর আমেরিকায় গিয়ে উচ্চতর পড়াশুনো করার জন্য বৃত্তি মঞ্জুর করেন। ১৯১৩ সালের জুলাই মাসে ভীমরাও নিউইয়র্ক পৌঁছন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভর্তি হন। বিষয় ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

আমেরিকায় পড়াশুনো করতে গিয়ে আম্বেদকর এক নতুন জীবনবোধের মুখোমুখি হন। এক দরিদ্র দলিত যুবকের জাতভিত্তিক বদ্ধ ভারতীয় সমাজে পঠনপাঠনের অভিজ্ঞতা থেকে মুক্ত ও আধুনিক আমেরিকান সমাজে পড়াশুনো করার অভিজ্ঞতা। সহপাঠীদের মধ্যে কথা বলায় কিংবা মেলামেশায় কোনো আপত্তি নেই। জাতি পরিচয়ের জন্য সারা শিক্ষাজীবন জুড়ে ভারতে আম্বেদকরকে প্রতি পদে নানা প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হচ্ছিল। আমেরিকায় এমন কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। কো-এডুকেশন স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, ছেলে-মেয়েরা এক সাথে পড়াশুনো করছে। এইসব অভিজ্ঞতা ভারতীয় সমাজের সমস্যাগুলিকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটিয়েছিল আম্বেদকরের মনে। ১৯১৫ সালে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১৬ সালের মে মাসে একটি সেমিনারে ভারতের জাতব্যবস্থা বিষয়ে তাঁর একটি পেপার পশ্চিমী বুদ্ধিজীবীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯১৬ সালের জুন মাসে আম্বেদকর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি থিসিস জমা দেন। গবেষণা বিষয়ের শিরোনাম ছিল 'ন্যাশনাল ডিভিডেন্ট ফর ইণ্ডিয়া— এ হিস্টোরিক অ্যান্ড অ্যানালাইটিকাল স্টাডি'। পি.এইচ.ডি জমা দিয়েই তিনি লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স অ্যান্ড পলিটিকাল সায়েন্স-এ অর্থবিজ্ঞানে ডি.এস.সি করবার জন্য যুক্ত হন। কিন্তু বৃত্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় তাকে বরোদায় ফিরতে হয়। এর মধ্যে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৭ সালে তিনি পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

বৃত্তির চুক্তি অনুযায়ী ড. বি. আর. আম্বেদকরকে বরোদায় চাকরিতে যোগ দিতে হয়। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারেন জাতভিত্তিক বদ্ধ ভারতীয় সমাজ একটুও বদলায় নি। তাঁর মত উচ্চশিক্ষিত একজন মানুষকে প্রতিনিয়ত অপদস্থ-অপমানিত হতে হতো কারণ জাত সূত্রে 'অস্পৃশ্যতা'। উচ্চবর্ণের মানুষেরা বরোদা মহারাজার সচিবালয়ে ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের উচ্চ পদ ও পাণ্ডিত্যকে সহ্য করতে পারছিলেন না। প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে হেনস্থা করা হতো। বিরক্ত হয়ে তিনি বোম্বাই চলে আসেন। সিডেনহ্যাম কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দেন। এখানেও অস্পৃশ্য জাতভুক্ত হওয়ার কারণে তাঁকে প্রতিনিয়ত বঞ্চনা ও অপমানের শিকার হতে হয়।

নিজের অসমাপ্ত পড়াশুনা সম্পূর্ণ করতে এক শুভানুধ্যায়ীর আর্থিক সহায়তায় আবার তিনি লণ্ডন যান। এদেশে সন্তান-পরিবার দেখাশোনার দায়িত্বে থেকে গেলেন

তাঁর স্ত্রী রমাবাঈ। লণ্ডনেও আর্থিক কারণে তাঁকে খুব কষ্টকর জীবন অতিবাহিত
হয়। এরই মধ্যে ১৯২২ সালে তিনি ব্যারিষ্টার হলেন। পরের বছর ১৯২৩ সালে
লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এসসি ডিগ্রি লাভ করেন। ঐ বছরই তিনি দেশে ফেরে
এবং তার কিছুকাল পর থেকেই বোম্বাই উচ্চ আদালতে ব্যারিষ্টারি পেশায় যোগ দে
নানা প্রতিভার অধিকারী ছিলেন ড. আম্বেদকর। অপরিসীম মেধা ও প্রতি
বৈপরীত্য, প্রতিবন্ধকতা, কঠোর সংগ্রাম, আদর্শনিষ্ঠায় ভরা এমন জীবনবৃত্তান্ত খুব
সংখ্যক মনীষীর জীবনে খুঁজে পাওয়া যাবে।

সংগঠন ভাবনা

ভীমরাও আম্বেদকরের পিতা রামজী বিশ্বাস করতেন শিক্ষা এবং সচেতনতা ব্যতী
দলিত সমাজের মুক্তি আদৌ সম্ভব নয়। ড. ভীমরাও আম্বেদকর তাঁর নিজের জীবনে
অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন যে দলিত-মুক্তির জন্য শিক্ষা এবং সচেতনতা অবশ্য
প্রয়োজন কিন্তু তার সাথে প্রয়োজন এই অধীত চেতনা রূপায়ণের লক্ষ্যে উপযু
সংগঠন। দলিত মানুষের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল আম্বেদকরের মূল লক্ষ্য। ঐ
লড়াই ছিল ভারতীয় জাত-ভিত্তিক বদ্ধ সমাজে যুগ যুগ ধরে চলে আসা অন
সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে। তিনি মনে করতেন, দেশের সামগ্রিক উন্নতির স্বার্থে
দলিতদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা দেওয়া জরুরী। বঞ্চিত দলিত সমাজে
স্বতন্ত্র সত্তা নির্মাণের লক্ষ্যে তিনি সংঘবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। এ
কারণে তাঁর নেতৃত্বে ১৯২৪ সালে 'ডিপ্রেসড্ ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশ
গঠিত হয়। অস্পৃশ্য জাতভুক্ত মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি, শিক্ষা-সচেতনতার প্রস
ং যুক্তিবাদী সামাজিক বাতাবরণ তৈরি করাই ছিল এই সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ
গঠন ১৯২৭ সালে মাহারে এক পরিষদ গঠন করে। দলিতদের স্থানীয় দাবিগুলি
রূপায়ণের লক্ষ্যে এই পরিষদ কর্মসূচি গ্রহণ করে। হাজার হাজার দলিত মানুষে
পস্থিতিতে এক জনসভা সংঘটিত হয়। এই সভায় ড. আম্বেদকর দলিত মানুষকে
সংস্কার থেকে নিজেদের মুক্ত করে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার পরামর্শ দে
তাঁর মতে, এই হতাশ অবস্থা থেকে মুক্তির প্রথম শর্ত হলো নিজেদের মর্যাদাবোধ এ
আত্মবিশ্বাস। এই পরিষদের সিদ্ধান্ত মতো 'মনুস্মৃতি' গ্রন্থটি প্রকাশ্যে পোড়ানো হ
কারণ মনু অস্পৃশ্যতা সমর্থন করে শূদ্রজাতির নিন্দা করেছিলেন। এই ভাবে দলি
সমাজের সামাজিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হলো। অস্পৃশ্য করে রা
মানুষদের আন্দোলনের মধ্য দিয়েই কোলাবার প্রসিদ্ধ চৌদুয়ার জলাশয় তাঁরা ব্যবহ

করার অধিকার অর্জন করলেন। ১৯২৮ সালে হিন্দু মন্দিরে তথাকথিত অস্পৃশ্য মানুষের প্রবেশাধিকার স্বীকৃতি লাভ করল। এখানকার দলিত নেতারা প্রথমে তাঁদের আলাদা একটি মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। ড. আম্বেদকর তাঁদের বোঝান দলিত মানুষের জন্য আলাদা মন্দির নির্মাণ করলে এই সামাজিক বৈষম্যকেই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হবে। তাছাড়া আম্বেদকরের কাছে মূর্তিপূজোর চেয়ে মানব সেবাই অনেক বেশি গুরুত্ব পেত। ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসে ড. আম্বেদকরের সম্পাদনায় প্রকাশিত মারাঠী ভাষার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মূক নায়ক' এবং ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে মারাঠী পাক্ষিক পত্রিকা 'বহিষ্কৃত ভারত' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা দুটিতে দলিতদের সমানাধিকারের দাবিতে যুক্তিপূর্ণ রচনা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। সমানাধিকারের দাবিতে দলিত সমাজের আন্দোলনের সপক্ষে বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপট গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এই পত্রিকাদ্বয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। দলিত সমাজের আত্মমর্যাদা ও সমানাধিকারের আন্দোলনের পরিসর আরও বৃদ্ধি করতে তিনি ১৯২৮ সালে বোম্বাইতে 'ডিপ্রেসড্ ক্লাসেস এডুকেশন সোসাইটি' গঠন করেন এবং 'সমতা' নামে আরও একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশনার কাজ শুরু করেন।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেন ও অধ্যাপক জঁ দ্রেজ-এর মতে, ড. বি. আর. আম্বেদকর আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে সংগঠন, আন্দোলন, বিক্ষোভকে সবল ও তথ্যনিষ্ঠ যুক্তিভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। আম্বেদকরের আহ্বান ছিল—'শিক্ষিত করো, বিক্ষুব্ধ করো এবং সংগঠিত করো।' এখানে তাঁর প্রথম শব্দটি খুবই মূল্যবান : 'শিক্ষিত করো'— যার ভিত্তি হবে সঠিক তথ্য এবং যুক্তি নির্ভরতা।

আম্বেদকরের সমাজচিন্তা

ড. বি. আর. আম্বেদকর ভারতীয় সমাজে চতুর্বর্ণাশ্রম ও জাতব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে সুগভীর অধ্যয়ন করেছিলেন। বর্ণ ও জাতভিত্তিক সমাজের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা তাঁর 'The Annihilation of Caste' (1936) গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়। তাঁর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিতে ছিল যে ভারতে জাতবর্ণ ভিত্তিক সমাজকাঠামোই মূলত সমাজ প্রগতির পথে বড় অন্তরায়। সেটা কেবল এই কারণে নয় যে, এই ব্যবস্থার ফলে স্বাভাবিক শ্রমবিভাজন ঘটতে পারেনি এবং অর্থনৈতিক দক্ষতাও গড়ে উঠতে পারেনি। এর চেয়েও গভীর সমস্যা হলো যে এর ফলে এক অতীব ক্ষতিকর সামাজিক বিভাজন তৈরি হয়েছে। সমাজের মানুষ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র খোপে খোপে আবদ্ধ থেকে গেছে। বি. আর. আম্বেদকরের মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, জাতপাতের

প্রথাটি কেবল শ্রমের বিভাজন নয়, শ্রমিকের বিভাজনও বটে। তিনি আরও বলেন 'জাতিবর্ণ ভিত্তিক ব্যবস্থা কেবল শ্রমবিভাজন থেকে ভিন্ন গোত্রের শ্রমিক বিভাজনে একটি ব্যবস্থাই নয়, এটা এমন এক উচ্চাবচ কাঠামো, যেখানে এক স্তরের শ্রমিকের অবস্থান আর এক স্তরের নীচে।' জাত বর্ণভিত্তিক উচ্চাবচতার ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজে এই 'স্তরবিন্যস্ত অসাম্য' শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজনকে আরও জটিল করে তুলছে। ফলে এই ক্ষতিকর অবস্থার পরিবর্তনের কাজটা আরও কঠিন হয়ে যায়। উপরিউক্ত গ্রন্থটিতে ড. আম্বেদকর তাঁর যুক্তিবাদী প্রত্যয়যুক্ত লেখনীতে হিন্দুসমাজে জাতব্যবস্থা বিলুপ্তির পন্থা প্রকরণ সুপারিশ করেছিলেন। তাঁর মত, অন্তর্বিবাহ-ব্যবস্থার মাধ্যমেই জাতব্যবস্থা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সুরক্ষিত থাকে। সেই কারণে, অসবর্ণ বিবাহের ব্যাপক প্রচলন জাতব্যবস্থা বিলুপ্তির অন্যতম প্রাক্-শর্ত। কারণ বিভিন্ন জাতভুক্ত মানুষের বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে জাত নব প্রজন্মের অস্তিত্ব ও বৃদ্ধির মাধ্যমেই এই জাতব্যবস্থা বিপন্ন হবার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।

ড. আম্বেদকরের মতে, ভারতীয় হিন্দু সমাজ থেকে জাতব্যবস্থা বিলুপ্তির অন্যতম পন্থা হিসেবে বিভিন্ন জাতগোষ্ঠীর সদস্যদের সমবেত বা একত্রিত খাদ্য গ্রহণকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর মতে, জাতব্যবস্থার বিলুপ্তির মধ্য দিয়েই হিন্দুসমাজ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হতে পারে। ভারতীয় সমাজে জাতব্যবস্থা অবলুপ্তির প্রয়োজন ও পন্থা নিয়ে ড. আম্বেদকরের সুপারিশগুলির পটভূমিতে ছিল ভারতীয় জাতব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ গবেষণাধর্মী অধ্যয়ন। তিনি মনে করেন, জাতব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথ্য আর তত্ত্বমূলক অনুসন্ধিৎসা, বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেই করা উচিত, এই বিষয়টি শুধুমাত্র আবেগধর্মী আলোচনার বিষয় নয়। এই কাজটিই তিনি করে দেখিয়েছিলেন তাঁর যুব বয়সে ১৯১৬ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিষয়ক এক সেমিনারে। এখানে আম্বেদকরের উপস্থাপিত গবেষণা প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'কাষ্ট ইন ইণ্ডিয়া : দেয়ার মেকানিসম্, জেনোসিস্ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট।' তাঁর এই বিষয়ে তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্য উপস্থিত বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চতুর্বর্ণাশ্রম ও হিন্দু সমাজের বিভিন্ন আচরণ বিধি এবং তার উৎপত্তি সম্পর্কে সুগভীর অধ্যয়নের পরিচয় পাওয়া যায় আম্বেদকরের প্রবন্ধে।

আম্বেদকরের মতে, জাত-বর্ণ প্রথা ভারতীয় সমাজে যুগ যুগ ধরে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে শাস্ত্রের সমর্থনে আর মানুষের বিশ্বাসে। ধর্মবিশ্বাসী মানুষ মনে করে জাতপ্রথা এবং এই সংক্রান্ত রীতি-নীতি যেহেতু শাস্ত্রসম্মত তাই এসব সত্য এবং অবশ্য

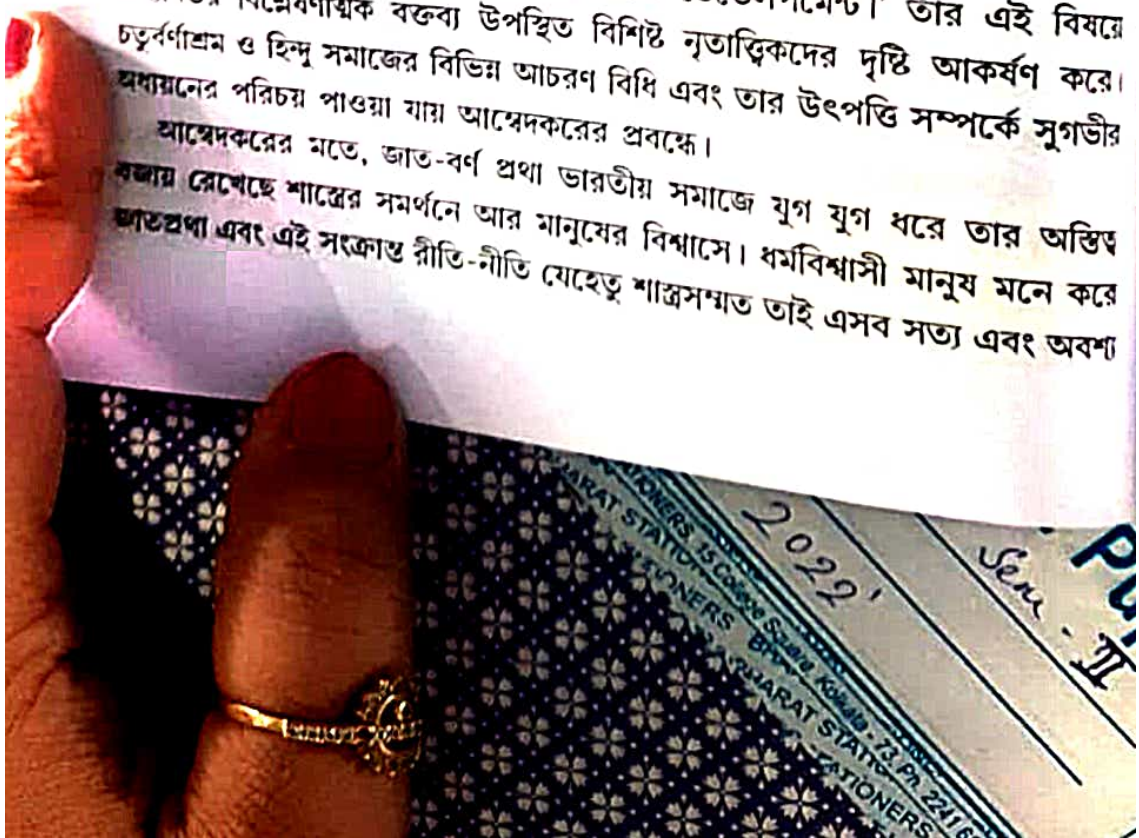

দূর করে সামাজিক সাম্য এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করাকেই তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্য হিসেবে অগ্রাধিকার দেন।

ড. বি. আর. আম্বেদকর সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় সমাজে অস্পৃশ্যতার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। এই বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল—১৯৪৩ সালে প্রকাশিত 'হুইচ ইজ ওয়ার্স?' স্লেভারি অর আনটাচেবিলিটি', ১৯৪৬-এ লেখা 'হু ওয়্যার দা শূদ্রস্?' ১৯৪৮-এ প্রকাশিত তাঁর এ সম্পর্কিত বিশিষ্ট গ্রন্থ 'দ্য আনটাচেবলস : হু ওয়্যার দে অ্যান্ড হোয়াই দে বিকেম আনটাচেবলস?'। এছাড়াও 'অন আনটাচেবলস', 'অ্যান এন্টি-আনটাচেবিলিটি অ্যাজেন্ডা' প্রভৃতি এই বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনা। আম্বেদকারের মতে, একটি ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা হিসেবে অস্পৃশ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে হিন্দুধর্মের অনুশাসন। তাই তিনি অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু চতুর্বর্ণ প্রথার বিরুদ্ধেও সচেতনতা বৃদ্ধির আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর মতে, হিন্দু সমাজে প্রচলিত এই প্রথা অসাম্যের প্রতীক। তিনি মনে করতেন জাতব্যবস্থার অবলুপ্তি না হলে ভারতীয় সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করা যাবে না।

১৯৩১ সালের ১৪ই আগষ্ট গান্ধীজীর সঙ্গে ড. আম্বেদকরের ভারতীয় হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ বিষয় এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। এর প্রেক্ষাপট ছিল ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনবিধি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে লণ্ডনের হাউস অব লর্ডসে ১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর আহূত গোল টেবিল বৈঠক। এই বৈঠকে ড. আম্বেদকর বলেন, তিনি ভারতের মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ নির্যাতিত মানুষের প্রতিনিধি। ব্রিটিশ রাজত্বে এক বিরাট সংখ্যক নির্যাতিত মানুষ ক্রীতদাস অপেক্ষাও ঘৃণ্য অবস্থায় জীবন যাপন করে। জলাশয়, মন্দির, শিক্ষা নিকেতন প্রভৃতিতে অস্পৃশ্য জাতভুক্ত মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। সরকারী চাকুরী, পুলিশ ও সেনা বিভাগে নিম্নবর্ণের মানুষ সমান অধিকার পায় না। এরা ন্যূনতম মজুরী পায় না। জমিদার, মহাজনদের শোষণ এদের নিঃস্ব করে দিয়েছে। দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার কারণে নানা কুসংস্কার এদের চিন্তা-চেতনাকে গ্রাস করেছে। প্রতিদিন এদের উচ্চবর্ণের নিপীড়ন সহ্য করেই বাঁচতে হয়।

গান্ধীজীর সাথে ১৯৩১ সালের আলোচনাতেও ড. আম্বেদকরের বক্তব্য ছিল [illegible]-অভিযোগে ভরা। তাঁর অভিযোগ ইংরেজদের প্রভুত্বমূলক আচরণ তো [illegible]র্ণ হিন্দুরাও দলিত মানুষের সাথে অমর্যাদা ও নিপীড়নমূলক আচরণ করে। [illegible]মানুষদের প্রতি কুকুর বিড়ালের থেকেও ঘৃণ্য আচরণ করা হয়। গোলটেবিল

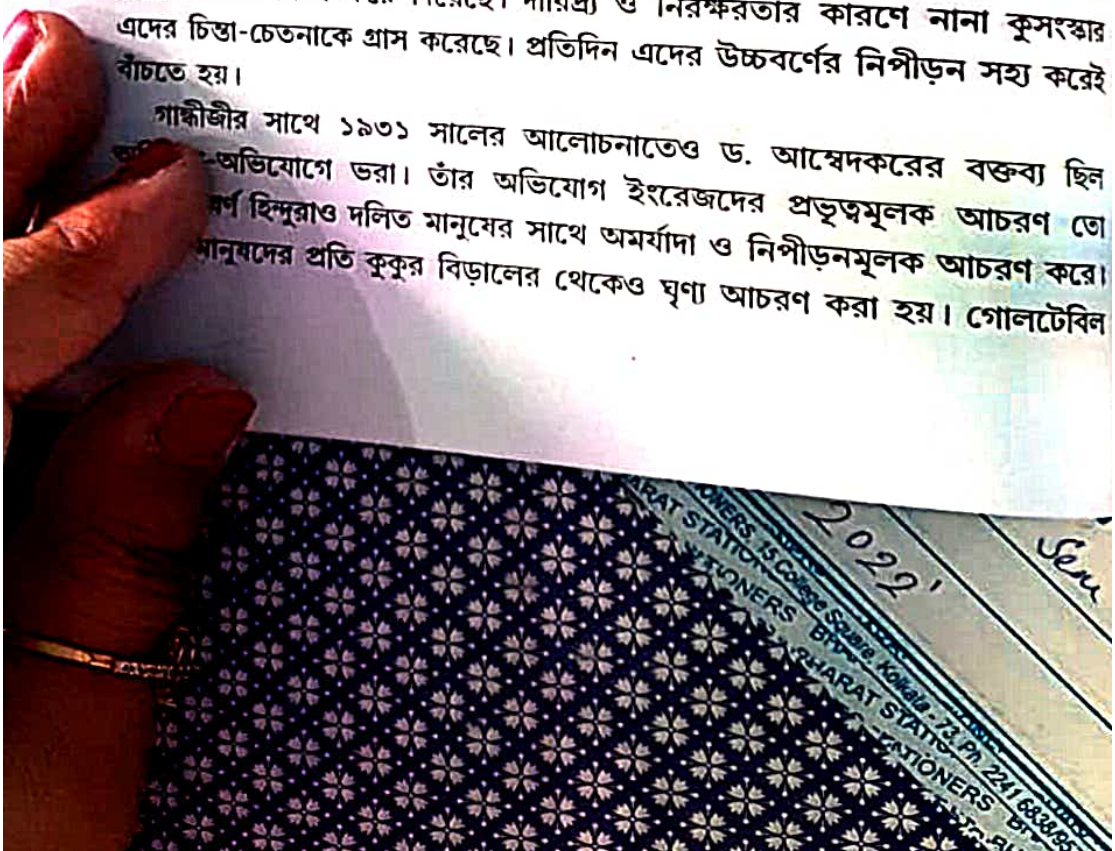

পরবর্তীতে তাঁর বক্তব্যের সূত্রেই গান্ধীজীর কাছে ড. আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের জন্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অধিকারের প্রয়োজনের বিষয়টি উত্থাপন করেন।

জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডোলজির বিখ্যাত অধ্যাপক জেকবির সান্নিধ্য আম্বেদকরের জীবনে আর একটি আলোকবর্তিকার মতো। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ বিভাগে আছে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের প্রচুর সংগ্রহ। অধ্যাপক জেকবির সাথে আলোচনা আর গ্রন্থাগারে অমূল্য সব গ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে আম্বেদকর প্রাচীন ভারতের সমাজ, বর্ণপ্রথা, জাতব্যবস্থা, অস্পৃশ্যতার উদ্ভব ইত্যাদি বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। ম্যাক্সমুলারের করা 'মনুস্মৃতি'র ইংরেজী অনুবাদ তিনিও আগে পড়েছিলেন। সেই সময়ই আম্বেদকরের চিন্তা-চেতনায় আলোড়ন জেগেছিল। অধ্যাপক জেকবির পরামর্শে আবার স্যার উইলিয়ম জোন্সের অনুবাদ করা 'মনুসংহিতা' পড়েন। আম্বেদকরের মনে হলো এই গ্রন্থের অধিকাংশ শ্লোকই যেন এক একটি অদৃশ্য শেকল, হিন্দু সমাজে জাত বহির্ভূতদের অস্পৃশ্য করে রাখার ক্ষেত্রে যা কঠোর ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। নারীদের সম্পর্কেও রয়েছে সব চরম অপমানজনক উক্তি। তাঁর মতে, মনুস্মৃতি ভারতীয় সমাজে উঁচু জাতগোষ্ঠী কর্তৃক নীচু জাত ও অস্পৃশ্যদের উপর শোষণ ও নির্যাতনের এক অমানবিক ব্রাহ্মণ্যবাদী দলিল। তাই আম্বেদকরের কাছে ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলন একই সাথে সমাজের মানুষের মনুবাদী চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধে আন্দোলন। তিনি মনে করতেন, মনুবাদী এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তা-চেতনার আধিপত্যে এমন সমাজ গড়ে তোলা খুব কঠিন যেখানে অস্পৃশ্য-দলিতরা বঞ্চনা ও নিপীড়ন থেকে মুক্ত হবে। তাঁর মতে, একটি সাম্যভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন দলিত সমাজের আত্মবিশ্বাস এবং আত্মজাগরণ। তিনি চেয়েছিলেন নিজেদের স্বার্থের কারণেই তারা সচেতন ও সংগঠিত হবে। এই উদ্দেশ্যে আম্বেদকর অস্পৃশ্য-দলিত জাতিকে পাঁচটি নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এই নীতিসমূহ একসাথে 'পঞ্চসূত্র (Five Principles) নামে পরিচিত। এগুলি হল— আত্মউন্নতি, আত্মপ্রগতি, আত্মনির্ভরতা, আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাস।

আম্বেদকর মনে করতেন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে দলিত সমাজের মানুষদের দৈনন্দিন জীবনচর্যায় পরিবর্তন আনতে হবে। আচরণ, সামাজিক অভ্যাস, পেশা বা বৃত্তি ইত্যাদিতে পরিবর্তন প্রয়োজন। মাদকাসক্তি এবং পচা খাদ্য ভক্ষণ পরিহার করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে ড. আম্বেদকর দলিত সমাজের শিশুদের শিক্ষা, সচেতনতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সুরুচি ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর সবচেয়ে বেশি

গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, দলিত-অস্পৃশ্য জাতির উপর উঁচু জাতের নির্যাতন নিপীড়নের বিরুদ্ধে দলিত জাতির জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দলিত সমাজের নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার ভিত্তি হবে আরও তিনটি নীতি (Three Principles)। এগুলি হল— শিক্ষা, অসন্তোষ ও সংগঠন (Education, Agitation and Organisation)। ড. আম্বেদকরের মতে প্রথমত, উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে দলিত সমাজের মানুষের মর্যাদা আদায় করার প্রাথমিক শর্ত শিক্ষিত হওয়া। দ্বিতীয়ত, নিজেদের 'দলিত' অবস্থার 'ধর্মীয়' ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না থেকে এই নিপীড়িত অবস্থার জন্য 'উঁচু জাতের' যারা দায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ তৈরি করতে হবে। তৃতীয়ত, এসবের উপর নির্ভর করে তৈরি করতে হবে দলিত শ্রেণির মানুষদের আত্মপরিচয়ের ভিত্তিতে এক নিজস্ব সংগঠন। ড. আম্বেদকর মনে করেন দলিত সমাজের সামগ্রিক লক্ষ্য পূরণে সংগঠিত কর্মপ্রচেষ্টা অপরিহার্য।

নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত

ড. বি. আর. আম্বেদকরের সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বৃহত্তর পরিসরে ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থায় সামগ্রিকভাবে নারী অবদমনকেও ছুঁয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় সমাজে অবদমিত মানুষের মধ্যে এক বৃহৎ অংশ নারী। তাই তাঁর সামাজিক ন্যায় সম্পর্কিত ভাবনার অনেকটাই জুড়ে ছিল জাত-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতীয় সমাজে নারীর অবদমন। ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থার সঠিক সমালোচনা করতে গিয়ে তাঁর কথায়-লেখায় বার বার উঠে এসেছে পিতৃতন্ত্রের বিরোধিতা। দলিত সমাজের অভ্যন্তরেও [redacted] বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনলস ছিলেন ড. আম্বেদকর। জাত-প্র[redacted]

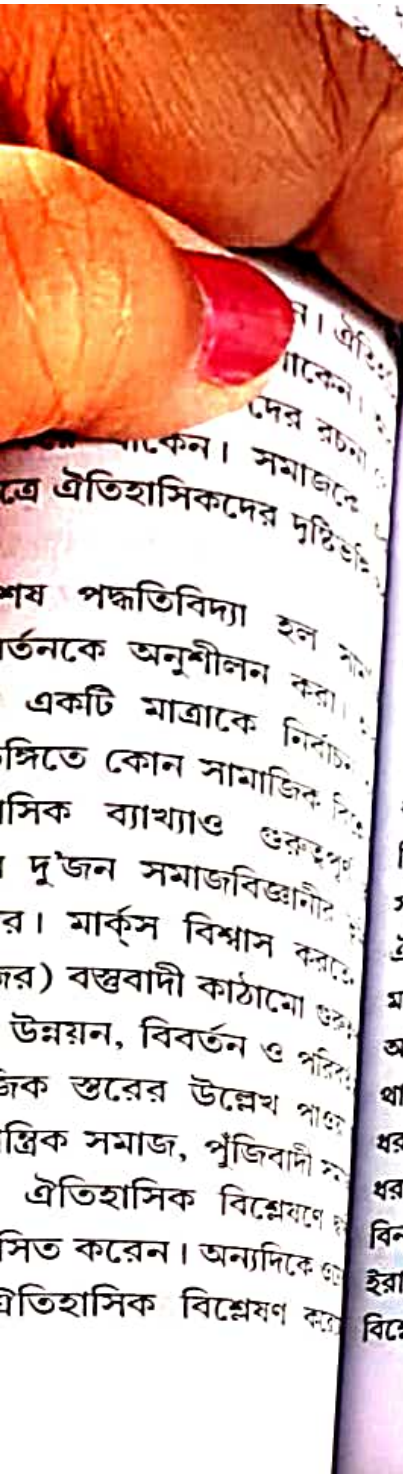

নীতি ও পুঁজিবাদী সমাজের ওপর রচনাটি এই পদ্ধতিবিদ্যার ব্যবহারের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতীয় সমাজ ও তার ইতিহাস চর্চায় এক উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিবিদ্যার ব্যবহার করেন জি ডি কোশাম্বি। তিনি অতীতের কোন ঘটনা, গুপ্ত, প্রথা ইত্যাদির বিশ্লেষণে প্রত্নবিদ্যা, মানব বিবরণ বিদ্যা (ethnography) দর্শনের আন্তঃবিষয়ক অনুসন্ধান রীতির ব্যবহার ঘটান। উৎপাদনের ধরণ, কৃষির . বিবাহ ও পরিবার ও অতীত / প্রাচীন সমাজের আর্থ-সামাজিক প্রকৃতি জাতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, এমনকি গ্রাম সম্পর্কে বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে তার রাখেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজ সম্পর্কিত আলোচনায় তার অত্যন্ত জরুরী এবং এই ইতিহাসকে উৎপাদনের ধরণ ও সম্পর্কের স্তরের ধারাবাহিক উপস্থাপনা হিসাবে দেখা উচিত।

রোমিলা থাপার প্রাচীন সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন। তিনি তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে একই ধরণের সমাজের মধ্যে আলোচনায় উৎসাহী ছিলেন। এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিত থেকে ভারতের ইতিহাস বিশেষত বৈদিক যুগের সামাজিক কাঠামো, প্রতিষ্ঠান, ধর্ম সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। ইতিহাসচর্চা, মানব বিবরণবিদ্যা ও ভারততাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভারতের সামাজিক ও ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত রচনায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

ভারততাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি : রাধাকমল মুখার্জি , জি. এস. ঘুরে, লুই দুমো : প্রাচীন পাঠ্য ও ভারতীয় সমাজ এবং সংস্কৃতির ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য ভারততাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাথমিকভাবে মনে করে যে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির এক বিশেষ উপস্থিতি আছে যা একমাত্র ভারতীয় সামাজিক বাস্তবতার নিরিখেই বিশ্লেষণ সম্ভব। ভারতীয় সমাজের বিশ্লেষণে এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় প্রাচীন পাঠ্য ও গ্রন্থাদির ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক পদ্ধতির ব্যবহার করে। ভারততাত্ত্বিকরা প্রাচীন ইতিহাস, মহাকাব্য, ধর্মীয় পাণ্ডুলিপি ও পাঠ্যের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আলোচনা করে। কোন দেশের ভাষা ও পাঠ্যে যে অন্তর্নিহিত অর্থ ও প্রতীকী বিশ্লেষণ থাকে তার ব্যাখ্যাই ভাষাতত্ত্ববিদ্যার তাৎপর্যপূর্ণ দিক। ১৮৭০ ও ৮০-র দশকে এই ধরণের ব্যাখ্যা ও চর্চার শুরু হয়। সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বে বিশেষত ভারতীয় ধারায় এই ধরণের চর্চা যাঁদের হাত ধরে শুরু হয় তাঁরা হলেন এস. ভি. কেট্‌কর, বি. এন. শীল, বিনয় কুমার সরকার, জি. এস. ঘ্যুরে, লুই দুমো, কে. এম. কাপাডিয়া, পি. এইচ. প্রভু, ইরাবতী কার্ভে প্রমুখ। সর্বপ্রথম যিনি ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি চর্চায় প্রাচীন গ্রন্থের বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই চর্চার সূত্রপাত ঘটান তিনি হলেন স্যার উইলিয়াম জোনস।

তিনি ১৭৮৭ সালে সংস্কৃত ও ভারততাত্ত্বিক চর্চার সূত্রপাত করেন। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে আলোচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

রাধাকমল মুখার্জি এই দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম প্রবক্তা। তিনি ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা চর্চা কাঠামো ক্রিয়াবাদী তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুরু করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে তিনি দেখান ভারতীয় সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ও সামাজিক-ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের মধ্যে আন্তঃনির্ভরশীল সম্পর্কের অনুধাবনে আন্তঃবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন আছে। তিনি অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্বে গ্রন্থতালিকাশ্রয়ী (bibliographic) গবেষণার মাধ্যমে তাঁর ভাবনাকে বাস্তব রূপ দে বাস্তব ক্ষেত্র ও উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবতার বিষয়টিকে দৃঢ়তা প্রদান করেন। তাঁর এই বাস্তবধর্মিতা বহুমাত্রিকতাবিশিষ্ট ছিল। তিনি দেখান ব্যক্তি, সমাজ ও মূল্যবোধের ঐক্যের সন্ধির মধ্যেই মানব প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন ঘটে ও তা প্রতিষ্ঠা পায়। সুতরাং ভারততাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তিনি তুলনামূলক পদ্ধতি ও আন্তঃবিষয়ক (Transdisciplinary) পদ্ধতিরও প্রয়োগ করেন।

ঘ্যুরে ভারতে সমাজতাত্ত্বিক চর্চার একজন অন্যতম পথিকৃত। তিনি বিস্তৃত ক্ষেত্র সমীক্ষার সাহায্যে বহুত্ববাদী তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটান। যদিও ঘ্যুরেকে পরবর্তীকালে আরামকেদারাশ্রয়ী সমাজতাত্ত্বিক (armchair sociologist) বলে সমালোচনা করলেও ঘ্যুরে ক্ষেত্র সমীক্ষা ও বাস্তব জীবন থেকে উপাত্ত সংগ্রহের ওপর জোর দেন। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে স্বল্প উপাত্তের ওপর নির্ভরশীল সাধারণীকরণের জন্য তাঁকে এই সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন পর্যালোচনার জন্য ঘ্যুরে বারবারই ভারতীয় প্রাচীন পাঠ্যের অনুশীলনের ওপর জোর দেন। তিনি মনে করতেন যে সাহিত্যের মাধ্যমেও ভারতীয় সমাজকে জানা যায়। ঘ্যুরে দেখান, সমাজভিত্তিক বিশ্লেষণে কীভাবে সাহিত্যের ব্যবহার করা সম্ভব। তিনি বেদ, শাস্ত্র, মহাকাব্য, কাশীদাসের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি তুলে ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে নানান দিক তুলে ধরেন।

লুই দুমো সমাজতত্ত্বে এক অন্যতম ব্যক্তিত্ব যিনি ভারততাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে গভীর আলোচনা করেন। ভারতীয় সমাজে জাতি ব্যবস্থা (caste system) কে নতুন আঙ্গিকে আলোচনা করার ক্ষেত্রে ভারততাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহার করে দুমো দেখান এই ব্যবস্থায় ভাবাদর্শ (ideology) ও ঐতিহ্যের গুরুত্ব কতটা। তাঁর পদ্ধতিবিদ্যায় ভাবাদর্শ আলোচনায় দ্বান্দ্বিক পরিবর্তন, ভারততাত্ত্বিক ও কাঠামোবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৌদ্ধিক ও ঐতিহাসিক (cognitive historical

approach) দৃষ্টিভঙ্গি এক একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তিনি ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থে জাতি ব্যবস্থার সঙ্গে ভাবাদর্শের সম্পর্কের অনুসন্ধান করেন। তিনি মনে করেন যে ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে এক ধরণের নির্দিষ্ট ঐক্য আছে যা থেকে নির্দিষ্ট ভাবাদর্শ বিশেষ উপাদান হিসাবে উপস্থিত থাকে। এই ভাবাদর্শ পশ্চিমী, আধুনিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ক্ষমতাশ্রয়ী ভাবাদর্শের থেকে বিপরীত। এই ভাবাদর্শের সাহায্যে বিশ্বাসিত ভাবাদর্শের একটি প্রান্তের (দ্বিকোটিক অবস্থানের একটি প্রান্ত) ভাবনাকে উপস্থাপিত করে। এই বিস্তৃত ও কর্তৃত্বকারী ভাবাদর্শ জাতি ব্যবস্থার বিশিষ্টতা বোঝাতে এক উল্লেখযোগ্য মাপকাঠি বলে দুমো মনে করেন।

দুমোর অনুসন্ধানের মডেলটি বিভিন্ন ধরণের ঐতিহ্য ও সভ্যতার ভাবাদর্শের কাঠামোর বৈচিত্র্যময়তাকে তুলনা করে সামাজিক পরিবর্তনের আলোচনা করে। তিনি দেখান একটি তাত্ত্বিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ধারণাটি সূক্ষ্মভাবে গ্রথিত থাকে। সে কারণে তিনি বিমূর্তায়ন ও তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে এই পরিবর্তনের ব্যাখ্যা ও প্রকৃতির অনুসন্ধান করতে আগ্রহী ছিলেন। দুমো দেখান ভারতের ক্ষেত্রে ক্রমোচ্চভাবে সজ্জিত ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভারতীয়দের মানসিকতায় পশ্চিমী সামাজিক ব্যবস্থায় সাম্যের ধারণার সঙ্গে বিরোধিতার ফলে ভারতীয় মননে পরিবর্তনের ধারণাটি একটি অভিযোজনমূলক ও পরিবর্তনশীল ব্যবস্থা হিসাবে গ্রথিত রয়েছে।

কাঠামো ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গী

সামাজিক ঐক্য সাধনে বিভিন্ন সামাজিক রূপ কিভাবে কার্যকর হয় তারই পর্যালোচনা করা হয় কাঠামো-ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে। এই দৃষ্টিভঙ্গির অনুগামীরা অনুধাবন করার চেষ্টা করেন এই সামাজিক বিশ্বে স্থিতাবস্থা ও নমুনা গঠন (patterning) কীভাবে ঘটে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে দ্বন্দ্ব ও বিরোধের বিপরীতে স্থিতাবস্থা, সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের মত উপাদানগুলির ওপর জোর দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয় একটি ব্যবস্থার কার্যকরী ঐক্যের মধ্যে দিয়ে কীভাবে সামাজিক স্থিতাবস্থা রক্ষিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজকে সামগ্রিকভাবে (holistically) দেখা হয়। অর্থাৎ একটি সামাজিক ব্যবস্থায় অন্তর্গত সব উপাদানই সমগ্র সমাজটির পক্ষে কার্যকরীভাবে প্রয়োজনীয় ও ক্রিয়াশীল থাকে। ভারতে [illegible]বাদী দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম প্রবক্তা হলেন এম. এন. শ্রীনিবাস। তিনি ছাড়াও [illegible] ব্যবহার করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন এস. সি. দুবে, [illegible], আই. পি. দেশাই, ডি. এন. মজুমদার প্রমুখ।

[illegible] এমিল দুর্খাইমের [illegible]

…নীয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্ধ বিশ্বাসই বেদ ও অন্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থকে প্রশ্নহীন করে রেখেছে। বেদই ভারতীয় সমাজে বর্ণ ব্যবস্থার ভিত্তি। ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্মমত কখনোই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়নি। ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ভাবাদর্শের মধ্যেই জাতবর্ণ প্রথার শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে। তাই শাস্ত্র সম্পর্কিত পবিত্রতাবোধ আর তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের মানসিকতার পরিবর্তন না হলে জাতভিত্তিক বদ্ধ সমাজ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর প্রশ্ন কেন ভারতীয় হিন্দু সমাজে নিম্নবর্ণের সঙ্গে খাদ্যগ্রহণ এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে আপত্তি রয়েছে। তথ্য অনুসন্ধানের পর তিনিই বলেন যেহেতু এই ধর্ম অনুসারে 'নীচু' জাতের সাথে ভোজন করা বা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মতো কাজকে সম্পূর্ণরূপে অপবিত্র কাজ বলে গণ্য করা হয়।

আম্বেদকরের মতে হিন্দুধর্ম জাত-বর্ণ ভিত্তিক 'স্তরবিন্যস্ত অসাম্যকে' স্বীকৃতি দেয়। মনুসংহিতায় জাতভিত্তিক ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। হিন্দু সমাজে স্তরবিন্যাস অনুসারে সর্বোচ্চ স্তরে আসীন ব্রাহ্মণ তারপর ক্রমশ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণদের স্বীকৃতি ও প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি ছিল। এই গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্মীয় শাস্ত্রের সহায়তায়। জাত বর্ণভিত্তিক রীতিনীতির কঠোরতা ব্রাহ্মণের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে অন্য জাতের সাথে খাদ্যগ্রহণ ও বিবাহসম্পর্কের ক্ষেত্রে। স্তরবিন্যস্ত হিন্দু সমাজে জাতবর্ণের অবস্থান অনুযায়ী ধীরে ধীরে নিয়মকানুন পালন করার কঠোরতা হ্রাস পেতে থাকে। ব্রাহ্মণদের মতো ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রেও অন্তর্জাতি বিবাহ, খাদ্য গ্রহণের বিধিনিষেধ, বৈধব্য, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি নিয়ম কানুন কঠোরতার সঙ্গে পালন করা হয়। কিন্তু এর নীচের জাতবর্ণগুলির মধ্যে নিয়মকানুন পালনের এতটা কঠোরতা লক্ষ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে উচ্চবর্ণের জাতগোষ্ঠীগুলি প্রবলভাবে আত্মসচেতন। তারা নিজেদের জাত পরিচয়ে আবদ্ধ থেকে তুলনায় নীচু জাতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে যাতে তাদের প্রতিষ্ঠা এবং সম্মানবোধের জায়গা কোনোভাবেই বিপন্ন না হয়। আম্বেদকরের মতে, উচ্চ জাতবর্ণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করতে গিয়ে নীচু জাতগুলির 'ক্ষুদ্রত্বকে' সচেতনভাবে প্রকট করা হয়েছে।

অস্পৃশ্যতা সম্পর্কিত

অস্পৃশ্য জাত হিসেবে পরিগণিত অতি দরিদ্র মাহার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আম্বেদকর। অস্পৃশ্য জাতভুক্ত হওয়ার কারণে শৈশবকাল থেকেই বর্ণবৈষম্যের অভিশাপে অভিশপ্ত ছিল তাঁর জীবন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা